আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৩ বর্ষ, দৈনিক ২৮৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৮ ভাদ্র ১৪২৫

বাংলায় ছাত্র রাজনীতি সংস্কৃতি হারাচ্ছে!

সম্পাদকীয় ১।

বাংলায় শিক্ষা সংস্কার। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে যে সিবিসিএস পদ্ধতি চালু হয়েছে, তাতে সিলমোহর দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, কলেজে হাজিরা কম হলে সেমেস্টারে ১০ শতাংশ নম্বর কাটা যাবে। অর্থাৎ, পূর্ণমান ১০০ হলে কাটা যাবে ১০ নম্বর। শুধু তাই নয়, আন্দোলন, শিক্ষক ঘেরাও চলবে না। বিক্ষোভেও জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। শিক্ষকদের সম্মান করতে হবে এবং আরও অনেক কিছু। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি, মেডিক্যাল কলেজে ঘেরাও, বিক্ষোভ, আন্দোলন, অনশনের জেরে যেভাবে শিক্ষাব্যবস্থার গলা টিপে ধরা হয়েছে, তাতে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য এর আগেও বহুবার ঘেরাও-বিক্ষোভ বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি করেছিলেন। তা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। বস্তুত তৃণমূল ছাত্র সংসদের বিরুদ্ধেই জেলায় জেলায় টাকার বিনিময়ে ভর্তির লাগাতার অভিযোগ উঠে এসেছে। এমনকী তার রেশ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্তও পৌঁছেছে। এমতাবস্থায় শনিবার আচমকাই সব জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কমিটি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। অর্থাৎ একটা বিষয় এক্ষেত্রে পরিষ্কার, ধমক-চমক দিয়েও দলের ছাত্র পরিষদকে বাগে আনতে পারেনি তৃণমূল। অভিযোগ আসা থামেনি। হয়তো সেই কারণেই কঠোর সিদ্ধান্ত। একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা এবার ঠিক করবে জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মাথায় কে বা কারা বসবে। টাকা বা পার্টির সুপারিশের ভিত্তিতে ভর্তির অভিযোগ বাম আমলেও ছিল। তৃণমূল জমানাতেও রয়েছে। আরও যে প্রবণতায় ছেদ পড়েনি তা হল, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ঘেরাও-বিক্ষোভ। অসম্মান। ছাত্র সর্বদা শিক্ষকের জ্ঞানের সামনে, তাঁর বিশাল ছায়ার সামনে অবনত থাকবে-একে রীতিও বলা যেতে পারে, ধর্মও। কিন্তু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যায়, শিক্ষক ছাত্রের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলেই ওই আসনে। কাজেই ছাত্রের ইউনিফর্ম গায়ে চাপিয়ে অহঙ্কার মানায় না। কীসের এই অহং? কেনই বা? আসলে ছাত্রের 'অধিকার' বলে বলীয়ান হয়ে পড়ুয়াদের ফেটে বেরনো গরিমাই যত নষ্টের গোড়া। রবি ঠাকুরকে ধার করাই যায় এখানে। তিনি লিখেছিলেন, 'অহংকারের কুফল সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্রমাত্রেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া রাখে। অহংকারে লোকের পতন হয় কেন। প্রথম কারণ, নিজের বড়োত্ব সম্বন্ধে অতিবিশ্বাস থাকাতে সে পরকে ঠিকমত জানিতে পারে না যেসংসারে পাঁচজনের সহিত বাস করিতে ও কাজ করিতে হয় সেখানে নিজের তুলনায় অন্যকে যথার্থরূপে জানিতে পারিলে তবেই সকল বিষয়ে সফলতা লাভ করা সম্ভব। চীনদেশ আত্মাভিমানের প্রবলতায় জাপানকে চিনিতে পারে নাই, তাই তাহার এমন অকস্মাৎ দুর্গতি ঘটিল। জার্মানির সহিত যুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্সেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। আর অতিদর্পে হতা লঙ্কা, এ কথা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, জ্ঞানই বল। কী গৃহে কী কর্মক্ষেত্রে পরের সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞানই আমাদের প্রধান বল। অহংকার সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতা আনয়ন করিয়া আমাদের দুর্বলতার প্রধান কারণ হইয়া থাকে।' অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে যে অহঙ্কারটা ছাত্রসমাজ মাঝেমধ্যে দেখিয়ে থাকে, তা আসলে দুর্বলতা ছাড়া কিছুই নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের সামনে বসে ছাত্র রাজনীতি, অধিকারের আন্দোলনে গলা ফাটানো বহু পড়ুয়াই চার বছর পর চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যান। যাঁরা তাঁদের আদর্শের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে শিক্ষক সমাজের পিছনে লাগেন, তাঁদের কেরিয়ারটা বেমালুম ডুবে যায়। ছাত্র রাজনীতি মানে গেরিলা যুদ্ধ নয়, শিক্ষককে অসম্মান করাও নয়। বরং গুরুর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং পড়াশোনাটা ঠিকমতো করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা মঞ্চ গড়ে তোলা। ভুল কি আর শিক্ষক বা প্রশাসক মহলের হয় না! নিশ্চয় হয়। কিন্তু তা শোধরানোর নামে শিক্ষকের গালে চড় বসানোটা কোনও আদর্শ ছাত্রের পরিচায়ক হতে পারে না। যদি সমাজ সেই পথেই হাঁটে, তাহলে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। তার অন্যতম প্রমাণ হল, বাংলা কিন্তু ছাত্র রাজনীতি থেকে নেতা তৈরি কার্যত বন্ধই করে দিয়েছে।

খতিয়ে না দেখেই শিলমোহর কেন?

সম্পাদকীয় ২।

হরিদেবপুরে ৭২ কাঠা ফাঁকা জমিতে 'নাটক'। দিকে দিকে এই বার্তা রটে গেল দ্রুত, প্লাস্টিকের প্যাকেটে পাওয়া গেছে ১৪টি ভ্রূণ বা নবজাতকের দেহ। তোলপাড় হওয়ার মতো খবরই বটে। এমন কিছু ঘটলে, গভীর তদন্ত হতে হবে। কী করে এল এবং এত? ভ্রূণ নিয়ে ভয়ঙ্কর ব্যবসা করছে কারা? দুপুর থেকে হইচই বেশ কয়েক ঘণ্টা। অবশেষে জানা গেল, প্যাকেটে ছিল ডায়াপার, চিকিৎসা বর্জ্য। প্রশ্ন হল, খবরটা ছড়াল কেন? এতই ভিত্তিহীন, যে, ওত-পেতে-থাকা বিরোধীরাও হইচই করার সুযোগ পেলেন না। তিন-চারজন নির্মাণকর্মী প্লাস্টিকের প্যাকেট দেখতে পেলেন। ওঁদের মনে হল, প্যাকেটে আছে ভ্রূণ। জমির দায়িত্বে থাকা উচ্চতর কর্মীরা জানালেন স্থানীয় কাউন্সিলরকে। তাঁর মনে হল, যথাস্থানে খবর দেওয়া দরকার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলেন মেয়র শোভন চ্যাটার্জি। পুলিসও প্রাথমিক খোঁজখবর নিয়েই জানাল, পাওয়া গেছে ১৪টি ভ্রূণ বা নবজাতকের দেহ। মেয়র উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। বিভাগীয় ডিসি প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতেই বলে দিলেন, হ্যাঁ, রয়েছে ভ্রূণ। সন্ধে সাতটার পর সেই পুলিসকর্তাই জানালেন, ভ্রূণ নয়, পাওয়া গেছে ডায়াপার, চিকিৎসা বর্জ্য। ভালভাবে খতিয়ে দেখার আগেই, নিশ্চিত না হয়েই কেন খবরটায় সিলমোহর দিয়েছিল কলকাতা পুলিস, দক্ষতায় যাদের তুলনা করা হয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে? প্রাথমিক 'খবর' পাওয়ার পরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সংবাদমাধ্যম, যথারীতি। সংবাদপত্রের তবু হাতে সময় থাকে, পরদিন সকালের কাগজে দিলেই হবে। নিউজ চ্যানেলের দায় প্রতি মুহূর্তে টাটকা খবর জানানোর। ব্রেকিং নিউজ। সংবাদমাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তারা নীরব থাকতে পারেন না। প্রশ্ন উঠবে, বলবেন না কেন? কিছু চেপে যাওয়া হচ্ছে? সেই চাপ এড়ানো উচিত। ঘটনাস্থলেই সাক্ষী রেখে ছবি তোলালে ভ্রূণ নিয়ে ভ্রম হত না। চলুক না গুজব কয়েক ঘণ্টা। তাড়াহুড়োয় বিপদ ডেকে আনার কী দরকার?

টেলকোকে জাতীয়করণ করতে চেয়েছিলেন নেহরুর জামাই ফিরোজ গান্ধী

"টেলকো যেসব ধরনের লোকোমোটিভ সরবরাহ করে তাদের আমদানি করতে দাম পড়ে ৩,১৮,৩৩৪ টাকা থেকে ৪,১৫,৮৩৩ টাকা কিন্তু টেলকোর লোকোমোটিভের জন্য সরকার ৭ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। তাছাড়া ওই ধরনের আমদানি করা লোকোমোটিভ চিত্তরঞ্জনে উৎপাদিত হলে তার জন্য দাম ধরা হচ্ছে ৬ লক্ষ টাকা। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেন এমন দামের ফারাক করে দিয়ে টেলকোকে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টা তখন লোকসভার অন্য সদস্যদের নজরে আসায় শুধুমাত্র মৌখিক জবাব যথেষ্ঠ নয় বলেই লোকসভার সদস্যরা মনে করেন। বিষয়টির আলোচনার জন্য আধ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ হয়। তবে পরে তা বাড়িয়ে দু'ঘণ্টা করা হয়েছিল। স্বাধীনতার কয়েকদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ২০ অগস্ট, ১৯৪৭ রেল বোর্ডের সঙ্গে টেলকোর চুক্তি হয় যা আবার তার থেকে দু'বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৫ থেকে কার্যকরী হওয়ার কথা বলা হয়।

বিশেষ প্রতিনিধি

জীবনবিমা জাতীয়করণের বিলকে সমর্থন করার সময় ফিরোজ গান্ধী লোকসভায় বার্তা দিয়েছিলেন শুধু এই বিলকেই তিনি সমর্থন করছেন না, পাশাপাশি তিনি আওয়াজ তুলেছিলেন বেশ কিছু ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার। আর তখনই তিনি তুলে ধরেছিলেন টাটা গোষ্ঠীর কেলেঙ্কারির কথা। এই শিল্প গোষ্ঠীর টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লোকোমোটিভ কোম্পানির (টেলকো) বেশ কিছু অনিয়ম তুলে ধরেন। সেই সময় এই সংস্থাটি জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে মুনাফা করছিল বলেও সংসদে সরব হয়েছিলেন। কারণ সরকার নিকৃষ্ট মানের রেলের ইঞ্জিন কিনছিল বেশি দাম দিয়ে। সেই সব তথ্য লোকসভায় ফাঁস করে সেদিন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর জামাই ফিরোজ গান্ধী টেলকো জাতীয়করণের দাবি তুলেছিলেন। টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে ফিরোজ গান্ধীর সুসম্পর্কই ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রাধান্য দেননি জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে। সেই সময় রেলওয়ে বোর্ড এবং টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং মধ্যেকার চুক্তির সমালোচনা করেছিলেন। ১৯৫৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর লোকসভায় ফিরোজ গান্ধী বলেছিলেন, ''যা পরিস্থিতি তাতে সরকারের কাছে একমাত্র বিকল্প হল টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লোকোমোটিভ কোম্পানিকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পরিণত করা। তা যদি আজ না করা হয় আমি নিশ্চিত তা আপনারা আগামিদিনে করবেন।'' পাশাপাশি ওই সময় তাঁর সুপারিশ ছিল আর যেন কখনও সরকার কোনও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে 'না-লাভ-না-ক্ষতি' নীতিতে কখনও চুক্তি না করে। সাংসদ তথা লোকসভার পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি এবং স্ট্যান্ডিং ফিনান্স কমিটির সদস্য থাকার

দরুন ফিরোজ গান্ধীর চোখে পড়েছিল, বেসরকারি সংস্থা টেলকো খুব সহজ শর্তে রেলকে বয়লার এবং লোকোমোটিভ সরবরাহের সুযোগ পেয়েছে অথচ সরকারি সংস্থা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ সংকটে দিন কাটাচ্ছে। এর ফলে তিনি তখন রেলের উপমন্ত্রী শাহনাওয়াজ খানের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন। এর উত্তরে শাহনাওয়াজ খান জানিয়েছিলেন, টেলকো যেসব ধরনের লোকোমোটিভ সরবরাহ করে তাদের আমদানি করতে দাম পড়ে ৩,১৮,৩৩৪ টাকা থেকে ৪,১৫,৮৩৩ টাকা কিন্তু টেলকোর লোকোমোটিভের জন্য সরকার ৭ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। তাছাড়া ওই ধরনের আমদানি করা লোকোমোটিভ চিত্তরঞ্জনে উৎপাদিত হলে তার জন্য দাম ধরা হচ্ছে ৬ লক্ষ টাকা। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেন এমন দামের ফারাক করে দিয়ে টেলকোকে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টা তখন লোকসভার অন্য সদস্যদের নজরে আসায় শুধুমাত্র মৌখিক জবাব যথেষ্ঠ নয় বলেই লোকসভার সদস্যরা মনে করেন। বিষয়টির আলোচনার জন্য আধ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ হয়। তবে পরে তা বাড়িয়ে দু'ঘণ্টা করা হয়েছিল। স্বাধীনতার কয়েকদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ২০ অগস্ট, ১৯৪৭ রেল বোর্ডের সঙ্গে টেলকোর চুক্তি হয় যা আবার তার থেকে দু'বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৫ থেকে কার্যকরী হওয়ার কথা বলা হয়। এরপর দেখা গেল টেলকো বয়লার এবং লোকোমোটিভ ঠিকমতো সরবরাহ করে উঠতে পারছে না। তাছাড়া আজমের লোকমোটিভ ওয়ার্কস যেখানে ১৮৯৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ৪৬০টি লোকোমোটিভ উৎপাদন করেছে সেখানে উলটে বরাত দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল টেলকোর উৎপাদন শুরুর আগেই। ফিরোজ তুলে ধরেছিলেন, আজমের লোকোমোটিভ থেকে হওয়া একেবারে দেশীয় লোকোমোটিভ যথেষ্টই উচ্চমানের ছিল। কারণ ১৯৩০ সালে লোকোমোটিভের জন্য প্রতি টন আমদানি খরচ ছিল যেখানে ১১৭০ টাকা, সেখানে আজমেরে উৎপাদন খরচ ছিল প্রতি টনে ১০০০ টাকা। এছাড়া কম সরবরাহের জন্য টেলকোকে ১২.৫১ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য হলেও বোর্ড তা মকুব করে দিয়েছিল এবং টেলকোর প্রেফারেন্স শেয়ারে সরকার দু'কোটি টাকা বিনিয়োগও করেছিল। ওই সময় ফিরোজ বিস্ময় প্রকাশ করেন টারিফ কমিশনের আচরণ দেখে। কারণ তাঁর অভিমত, সেই সময় তো কমিশনের উচিত ছিল বিদেশে থেকে আমদানি করা জিনিসের চেয়ে দেশে উৎপাদিত পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সব মিলিয়ে ফিরোজের হিসাব অনুসারে তখন দেশের মানুষের পাঁচ কোটি টাকা গিয়েছিল টেলকোর তহবিলে। কিন্তু লগ্নি করা এই টাকার কোনও সুবিধা দেশ পাচ্ছিল না। আর তারই জন্য টাটা গোষ্ঠীর সংস্থাটিকে অধিগ্রহণের কথা সংসদে তুলেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী।

তথ্য-
- **Feroze Gandhi : A Political Biography By Shashi Bhushan**
- **Feroze Gandhi : A Crusader in Parliament By Tarun kumar Mukhopadhyay**

ক্রান্তিকালে মানব সভ্যতা

বিশেষ প্রতিনিধি

সময় বহমান। সময় কারো জন্য বসে থাকে না। তাই বিখ্যাত প্রবাদ হলো-'সময় এবং জোয়ার কারো জন্য বসে থাকে না'। অথচ কিছু বিষয় আছে তার যেন গতি নেই এবং সম্ভবত থাকতে নেই। তারা এক সূত্রে বাঁধা। এরা চার, প্রকারান্তরে পাঁচ। তারা হলো স্বাধীনতা, বিচার, সুখ এবং সত্য। এর সাথে যোগ দেয় ভালোবাসা। এগুলো বয়ে চলে যেতে পারবে না। যদি চলে যায়, তার পরিণতি অথবা ফলাফল হবে অবিশ্বাস্য। যে আলোচনা এবং বিতর্ক এই পাঁচটি নিয়ে চলে তা হলো, কোনটি প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিতর্ক বেশি হয় যখন মানুষ তথা মানবসমাজ সঙ্কটে পড়ে। এমনি সময় এখন বিশ্বব্যাপী। এর জন্য কে দায়ী, তার আলোচনা হতে পারে। তবে কোনটি সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য, সে প্রশ্নটি সর্বাগ্রে অবশ্যই হওয়া উচিত। আলোচনায় সবাই এই পাঁচটির প্রত্যেকটিকে সবার প্রথম বলতে চেয়েছেন। একজন বলেছেন, স্বাধীনতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার মতে, স্বাধীনতা না থাকলে সত্যকে পাওয়া অসম্ভব। স্বাধীনতা থাকলে একটি সুবিচারপূর্ণ সমাজ গড়া সম্ভব এবং শুধু এমন সমাজেই সুখ থাকে। কারণ এমন পরিবেশে নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার থাকে এবং সেখানেই সুখ। একজন ব্যক্তি ইচ্ছেমতো তার সহযোগী, বন্ধু বা সমাজ বেছে নিতে পারে যদি স্বাধীনতা থাকে। সে কী ভাববে, কোন জ্ঞান অর্জন করবে বা কী করতে হবে, সেটা সম্ভব যদি তার স্বাধীনতা থাকে। বিশেষ করে সত্যানুসন্ধানের জন্য স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। সত্যের আভিধানিক অর্থ হলো 'কোনো কিছুর সঠিক অবস্থান, তবে সে সম্বন্ধে বিশ্বাস নয়।' এ জন্যই সত্য নিয়ে এত আলোচনা, আগ্রহ এবং এমনকি যুদ্ধ। আর এ জন্যই স্বাধীনতার মূল্য এবং অনুসন্ধান। অর্থাৎ নিজের মতো করে বাঁচতে চাইলে স্বাধীনতার বিকল্প নেই। আবার এটাও সত্য, শুধু স্বাধীনতা এবং সুবিচার হলেই সুখ নাও আসতে পারে। তবে এগুলো সুখের পথের দুটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কিন্তু সক্রেটিস সুবিচারকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন-সুবিচার থাকলে সত্য, সুখ এবং স্বাধীনতা সব কিছুই পাওয়া সম্ভব। তিনি বলেছেন, মানব মনের তিনটি অংশ মিলেই সুবিচারের সৃষ্টি করে। এই তিনটি অঙ্গ হলো-যুক্তি (রিজন), ক্ষুধা (এ্যাপিটাইট) এবং আত্মা (ইমোশনসোল)। এদের প্রীতিময় সংমিশ্রণ থাকলে সুখানুভূতি হয় অচঞ্চল। এই সুখানুভূতির একটি প্রধান বাহনকে বলা হয় 'বক্তব্যের স্বাধীনতা' এবং যেহেতু সংবাদমাধ্যম-এর প্রধান বাহক, তাই এর স্বাধীনতাও নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক যুগ যৌবনোত্তীর্ণ হলেও এই 'বক্তব্যের স্বাধীনতা' কোথাও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাবানেরা নানা স্লোগান এবং আন্দোলন সৃষ্টি করে এর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এমনকি তারা সাধারণ মানুষের মাঝে এমন ধারণা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে পেরেছে যে, এমনটিই স্বাভাবিক। অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মিঃ প্রতাপভানু মেহতা তার এক সাম্প্রতিক নিবন্ধে বিশ্বের এই অবস্থাকে 'মানসিক প্রতিবন্ধী সময়' বলে বর্ণনা করেছেন। তার সাথে একমত হবেন সব বোদ্ধাজন। অবশ্য মিঃ ভানু এই ধারণাটি গ্রহণ করেন অ্যালান বুলোক রচিত 'হিটলারের জীবনী' থেকে। বুলোক এ জীবনী লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, ফ্যাসিস্ট বা চরমপন্থীরা এক 'অদ্ভুত নিরাপদ অনুভূতিতে' অবস্থান করে তাদের জনবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে। ফলে আজ দেখা যাচ্ছে, সময়ের ধারাবাহিকতায় এই ক্ষমতাবানেরা তাদের অপকর্ম নির্বিঘেঙ্ক এই অনুভূতির মাঝ থেকে করছে। বুলোক বলেছেন, এ অবস্থা বিশ্বব্যাপী এখন সংক্রামিত। সব দলই ক্ষমতায় গিয়ে নিজেদের স্বার্থকে জনগণের স্বার্থ বলেই দাবি করে। যার ফলে জনগণ ক্রমান্বয়ে তাদের সব অধিকার হারিয়ে ফেলেছে বা ফেলছে। তারা সামান্য কিছু সুযোগ বা সুবিধা জনগণের সাথে ভাগাভাগি করে এমন ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে, জনগণ এর চেয়ে বেশি পেতে পারে না। এটাকেই বুলোক বলেছেন, 'মানসিক প্রতিবন্ধকতা'। রাজনীতিবিদেরা এই ধারণাকে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে। ফ্যাসিজম বা চরমপন্থীরাও নেয় এর সুযোগ। সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন ব্যবহার করা হচ্ছে সংবাদমাধ্যমকে। সরকার বা ক্ষমতাসীনেরা এটা ব্যবহারের জন্য আইন তৈরি করে। চরমপন্থীরা এটা ব্যবহার করছে শক্তির অপব্যবহার করে। যেমন, একটি উদাহরণ প্রায় সবার জানা, কারণ এর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। একটি অফিস বা কর্মস্থলকে একদল কর্মী নিজেদের দখলে আনতে চায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। অথচ সে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম এবং আইন অনুসারে তারা তা কোনো মতেই পারছে না। তখন তারা শক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণকারীদের হটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। আবার কখনো কখনো শারীরিকভাবে আক্রমণ করে। যদি নিয়ন্ত্রণকারীরা এর প্রতিরোধ শক্তি দিয়ে না করতে পারে, তখন তাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এমন অবস্থায় নিয়মনীতি, আইন অসহায়। এমন শক্তি ব্যবহারকারীরা যদি নিয়ন্ত্রণে কিছু সময় থাকতে পারে, তাহলে প্রচলিত ব্যবস্থা আইন-কানুন দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে। এ জন্যই প্রায়ই দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্ষমতায় গেলে নতুন ক্ষমতাসীনেরা প্রথমেই আইন-নিয়ম পরিবর্তনে মনোযোগ দেয়। যদি তারা জনকল্যাণকামী হয়, তবে তারা শুধু এই পরিবর্তনেই ব্যস্ত থাকে। যদি স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রিক হয়, তাহলে এই আইনগুলো তাকে এবং তাদের গোষ্ঠীকে সাহায্য করে। সমস্যা হয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি আইন নির্মাণ হলে, তা নিয়মানুসারে পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে। ফলে অনিয়মতান্ত্রিকতা প্রাধান্য পায়। তৃতীয় বিশ্বে এর প্রকোপ অত্যন্ত স্থূল এবং অমার্জিত। তাই তৃতীয় বিশ্বে সঙ্ঘাত এবং সংঘর্ষ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক। প্রায় ক্ষেত্রেই এই অনাচারের শিকারকেই দায়ী করা হয় এর জন্য। এর ব্যাপকতা এখন বিশাল। আগে কৌশলের সাথে এ কর্মকাণ্ডগুলো চালালেও, এখন প্রায়ই সে ভদ্রতার আশ্রয় ক্ষমতাবানেরা নিচ্ছে না। প্রযুক্তি এ ব্যাপারে ব্যাপক সাহায্য করছে। অতীতে এমন কর্মকাণ্ড চালাতে ক্ষমতালোভীদের জনমত সৃষ্টির জন্য নানা পদ্ধতির অনুসরণ করতে হতো। প্রযুক্তি তাদের এই কষ্ট থেকে রেহাই দিয়েছে। এই মানসিক প্রতিবন্ধিতা এখন রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রবল। এর অপর নাম 'ভণ্ডামি বা কপটতা'। ইংরেজিতে বলে হিপোক্রেসি। বলা হয় 'ভণ্ডামি হচ্ছে পাপের পুণ্যের প্রতি প্রদত্ত সম্মান।' তাই ভণ্ডামিকে শনাক্ত করা কঠিন এবং এ জন্যই জীবনের সব ক্ষেত্রে এর এত ব্যাপক ব্যবহার। রাষ্ট্র, সমাজ বা ব্যক্তিগতভাবে ভণ্ডামির ব্যবহারের প্রকার বিশাল। তবে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এটা এত সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে যে, মানুষের পক্ষে সহজে একে চিনতে পারা কঠিন। অধ্যাপক প্রতাপভানু ভারতের রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদির উত্থানকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'জনগণকে এই মানসিক প্রতিবন্ধিতায়' ফেলে মোদি সারা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, তার কর্মকাণ্ডই তাদের স্বার্থ। এটা করতে গিয়ে তিনি হিন্দুত্ববাদ এবং ধর্মকে ব্যাপক ব্যবহার করে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন। তিনি সংখ্যালঘিষ্টদের তার সমালোচনার অঙ্গ করে, প্রতিষ্ঠিত দলগুলোকে সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে পৃথক করতে পেরেছেন এবং ক্ষমতার সিঁড়িকে দখল করেছেন। আসলে মোদির এই কর্মকাণ্ডের অনুসরণ বিশ্বের সর্বত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠরা যেমন একদিকে সংখ্যালঘিষ্টদের ব্যবহার করছে, তেমনি সংখ্যালঘিষ্টরা অতি কৌশলে, তার মূল্য আদায় করে নিচ্ছে। কখনো কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠরা এটা বুঝতে পারলেও তাদের কিছু করার থাকে না। কারণ বিশ্বের সর্বত্র সংখ্যালঘিষ্টরাই ক্ষমতাসীন। অধ্যাপক ভানু সংস্কৃতির ব্যবহারকে 'শক্তির একটি চাবিকাঠি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কারণ রাজনীতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে সংস্কৃতি। যেহেতু মানুষ তার সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই রাজনীতির শুরুই সেখানে। তিনি দেখিয়েছেন জওহরলাল নেহরু এবং প্রেমচাঁদ কত কৌশলে এই সংস্কৃতিকে ধর্মের বাহন হিসেবে বর্ণনা করে তাদের রাজনীতিতে ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃতি কখনো মুক্তমনের উন্নত মূল্যবোধ সন্ধানের ভিত্তিভূমি নয় বলে মন্তব্য করে অধ্যাপক ভানু বলেছেন, 'এটা শুধুমাত্র কথিকা যার বিভিন্ন বক্তব্য সমাজের অংশীদারেরা অভিনয় করে থাকে।' সে জন্যই যুগে যুগে প্রশ্ন ওঠে, কোনটি আগে বা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ-স্বাধীনতা, সত্য, সুবিচার এবং সুখ? এবং এমন প্রশ্ন যেন না আসে তাই ক্ষমতাবানেরা সর্বপ্রথমে প্রতিবাদকে আক্রমণ করে থাকে। 'পপুলার রেজিসটেন্স' আন্দোলনের কেভিন থিস এবং মার্গারেট ফ্লাওয়ারস তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রথম বক্তব্যেই ঘোষণা করে 'প্রতিবাদ এখন ক্ষমতাবানদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য' এবং 'এ আক্রমণ যৌথভাবে করছে সরকার এবং করপোরেশনগুলো।' তারা লিখেছেন, ক্ষমতাসীন সরকারগুলো কোনো প্রতিবাদ বা দাবি সইতে নারাজ, বিশেষ করে যে প্রতিবাদগুলো জনপ্রিয় এবং জনগণকে সহজেই আকৃষ্ট করে। ফলে যেকোনো সমাবেশ সরকারগুলোর কাছে অগ্রহণীয়। এর কারণ হিসেবে তারা দেখিয়েছেন, বেশির ভাগ সরকার জনগণের প্রতিনিধিত্বের নামে নিজেদের স্বার্থকে উদ্ধার করে থাকে এবং তারা এ বিষয়ে সচেতন। তাই তাদের এই ভণ্ডামি প্রকাশ হলে তাদের ক্ষমতায় থাকা কঠিন হবে বলে কোনো প্রতিবাদকে তারা অনুমতি দিতে রাজি নয় এবং এমন অবস্থার একক অবস্থান বিশ্বব্যাপী। খবরের কাগজ খুললেই এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। শেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটকের একটি চরিত্র পলোনিয়াস। সে তার ছেলে লায়ারটিসকে উপদেশ দিচ্ছে, 'তুমি নিজের কাছে সত্যবাদী হও, তাহলে অন্যের কাছে মিথ্যাবাদী হতে পারবে না।' অর্থাৎ সত্য বিরাজ করলে মানুষের জীবনে সব প্রাপ্তি সহজেই ঘটে। সুখ যা সবার কাম্য, শুধু সত্য অবস্থানের সাথে জড়িত। আর স্বাধীনতা এর মূল ভিত্তি। বিশ্বে স্বাধীনতা এখন কোন অবস্থানে? দুটি অনুসন্ধান দুটি ফল দিয়েছে। ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ২০১৮ অনুসন্ধানে বলেছে, ২৫ শতাংশ দেশ মুক্ত নয়, ৩০ শতাংশ আংশিক এবং ৪৫ শতাংশ পুরো মুক্ত। অপর দিকে, 'গ্লোবাল বাই পপুলেশন' রিসার্চ দেখিয়েছে, বিশ্বের ৩৯ শতাংশ মানুষ মুক্ত, ২৪ শতাংশ আংশিক এবং ৩৭ শতাংশ মুক্ত নয়। 'ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' দেখিয়েছে বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ হওয়ার দ্বাদশতম বছরে এবার পদার্পণ করল। ৭১টি দেশে এ ধস এ সময়ে ক্রমগত চলছে। কেবল ৩৯টি দেশে কিছু উন্নত হয়েছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাজনৈতিক অধিকার এবং বেসামরিক স্বাধীনতা ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। বক্তব্য ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সবচেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত এবং এর অভাব সেনেগালে সবচেয়ে বেশি। এরপর জর্দান, বুর্কিনা ফাঁসো, ইউক্রেন, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, লেবানন ও জাপান। এই অনুসন্ধান আরো দেখেছে, দুর্নীতিবাজ এবং দমনমূলক সরকারগুলোর কর্মকাণ্ডে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিক্ত হচ্ছে। এমন শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে আছে মায়ানমার এবং কয়েকটি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ। এরা তাদের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে সুসংগঠিত করছে। মায়ানমারের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার বিশ্বের অত্যাচারিতের মাঝে শীর্ষে। হিউমান রাইটস ওয়াচ তাদের সর্বশেষ অনুসন্ধানে দেখিয়েছে 'বিশ্বে গণতন্ত্র এখন সঙ্কটে'। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যে স্বস্তির নিঃশ্বাসের জন্য প্রহর গুনছিল, তার শেষ নেই। স্বাধীনতার নামেও তাদের শৃঙ্খলিত করা হচ্ছে এবং তাদের অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এক কথায় বলা যায়, বিশ্ব এখন ক্রান্তিকালে এবং সন্ত্রাস হচ্ছে, শক্তিমান ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রকাশের প্রধান বাহন।